130

আজকের কাগজ

1 SEP 1994

বাংলাদেশ ও তার শিক্ষা ব্যবস্থার হালচিত্র

কাজী শাহজাহান

ইংরেজীতে একটি কথা আছে "Education is the back bone of a Nation" অর্থাৎ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ডহীন প্রাণী যেমন দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের ২৩ বছর পরও আমরা জাতির ভাগ্যন্নয়নে সফল হতে পারিনি। এর কারণ একটাই তা হচ্ছে- শিক্ষিত জনসমাজ গঠনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। যে উদ্দেশ্য ও চেতনা নিয়ে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম সে চেতনা, আশা-আকাংখা অনেকটাই ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কখনও কি আমরা প্রশ্ন করেছি এর কারণসমূহ কি? সত্যি কথা বলতে- শিক্ষিত জাতির অভাবে আমাদের মাঝে আজ নানা সমস্যা ওত পেতে বসেছে। বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা সমস্যা। আমাদের দেশে যে সকল শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে তা জাতি গঠনকল্পে কতটুকু ভূমিকা রাখবে সম্ভবত কেহ গুরুত্বসহকারে ভাবেন না। আর তার প্রমাণ মিলে আমাদের অশিক্ষিত জনসমাজের দিকে তাকালে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে শিক্ষিত লোকের হার ছিল শতকরা ২০ ভাগ। অথচ, বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হওয়া সত্বেও এ শিক্ষার হার ২৩ বছর পর উন্নীত হয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশে। তাহলে স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের শিক্ষিতের হার না বাড়ার পিছনে কারণগুলো কি কি? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিগত এবং প্রয়োগগত ভুলের কারণে আমরা এতটা পিছিয়ে আছি। অথচ, আমরা যদি সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলংকার দিকে তাকাই তবে এর সহজ উত্তর মিলে। শ্রীলংকায় শিক্ষিত লোকের হার গত ১৫ বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। চীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিক্ষা ব্যবস্থায় নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করায় আজ তারা নিজেদের শিক্ষিত জাতি হিসেবে পরিচিত দিতে সক্ষম হয়েছে। এশিয়ার একটি অশিক্ষিত জাতি হিসেবে আজও আমরা পরিচিত। অথচ, আমাদের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। বাংলা ভাষাভাষীর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে তাঁর 'গীতাঞ্জলী'র জন্য নোবেল পুরস্কার পান। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশে, জীবনান্দের রূপসী বাংলায় শিক্ষিত লোকের হারের দিকে তাকালে দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। বর্তমানে যে শ্লোগান দিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সে শ্লোগানটাই ভুলে ভরা। সম্প্রতি শিক্ষার উন্নতির জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা কার্যত বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আমাদের বাঙালি জাতির একটা মুদ্রাদোষ আছে তাহলো- আমরা কর্মসূচী প্রকাশ করতে দ্বিধান্বিত হই না, কিন্তু তা বাস্তবায়নের কথা আসলে পিছিয়ে যাই। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলতেন, "আমাদের কর্মসূচী আছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন নেই।" অর্থাৎ আমরা যা করতে চাই এবং যা করি এ দু'য়ের মাঝে একটা বিরাট তফাৎ রয়েছে তা স্পষ্ট। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা সহজে বুঝতে পারি, দিন দিন আমরা শিক্ষার দিকে অগ্রসর হব, কি, বরং পিছিয়ে যাচ্ছি। মূলতঃ শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ভুলের কারণে আমাদের এ দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। নিম্নে বাংলাদেশের শিক্ষার স্তর বিন্যাস দেওয়া হলো-

প্রাইমারী (১ম-৫ম শ্রেণী)
নিম্ন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী)
মাধ্যমিক (৯ম-১০ম শ্রেণী)
উচ্চ মাধ্যমিক (১১শ-১২শ শ্রেণী)
স্নাতক (পাস ও অনার্স)
স্নাতকোত্তর

উপরিউক্ত চার্টের দিকে তাকালে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছয়টি স্তরে বিভক্ত। আমি এ স্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব।

প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ অক্ষরজ্ঞান জাতি গঠনের প্রথম ও প্রধান উৎস। এ স্তরটি পার হয়ে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে হয়। সে অর্থে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা অকপটে স্বীকার করব। কিন্তু যে সকল ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে তা-ই যথেষ্ট নয়।

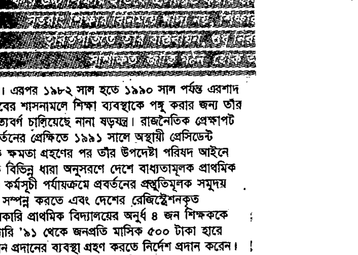

১৯৭২ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদা-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে পেশকৃত এই কমিশন রিপোর্টে ১৯৮০ সালের মধ্যে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিকরণ আইন জারী করা হয় এবং প্রায় ৩৬,৬৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। এখন এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩৭,৭৩৬টিতে উপনীত হয়েছে। ১৯৭৮ সাল হতে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। এরপর ১৯৮২ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এরশাদ সাহেবের শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার জন্য তাঁর আমাত্যবর্গ চালিয়েছে নানা ষড়যন্ত্র। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ আইনে বর্ণিত বিভিন্ন ধারা অনুসরণে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী পর্যায়ক্রমে প্রবর্তনের প্রস্তুতিমূলক সমুদয় কাজ সম্পন্ন করতে এবং দেশের রেজিস্ট্রেশনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুর্ধ ৪ জন শিক্ষককে জানুয়ারি '৯১ থেকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। তদানুসারে বাস্তবায়ন অনুকুল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং সময়মত সম্পন্ন করা হয়। ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করা হয়েছে এবং মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী গত ৩১ ডিসেম্বর '৯১ তারিখে রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের শুভ উদ্বোধন করেন। ১৯৯২ সালের জানুয়ারি অর্থাৎ শিক্ষা বর্ষের শুরু থেকে ৬০টি জেলার প্রত্যেকটির সদর থানায় এবং ৪টি বিভাগের যে জেলায় মহানগর অবস্থিত ঐ জেলার মহানগর সন্নিকটস্থ ২টি করে সর্বমোট ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। আইনে বর্ণিত বিষয়াদির নিরিখে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সার্থক বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ৬৮টি থানায় ৮০৯টি ইউনিয়নের ২,৫৮৮টি ওয়াড কমিটির উপর।

[illegible]

সম্প্রতি 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' এ কর্মসূচি দ্বারা শিক্ষা বিকাশের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করলে তারা জানান, "পূর্বেই ভাল ছিলাম। খাদ্য কর্মসূচি ঘোষণা করায় স্কুলে ছাত্রদের আগমন বেড়েছে তবে তারা পড়ালেখা শেখার উদ্দেশ্যে আসে না, নিছক ১৫ কেজি গম পাবার জন্য।" এছাড়া শিক্ষক মহল যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তাহলো- (১) যেহেতু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিটি ছাত্রকে মাসিক ১৫ কেজি গম প্রদান করে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় জমাচ্ছে। ফলে, একটি স্কুলে যতজন ছাত্র পাঠদান করার কথা তার চেয়ে ৪/৫ গুন বেড়ে যাচ্ছে এবং ছাত্রদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম হওয়ায় তারা সঠিক নিয়মে লেখাপড়া শেখাতে পারছেন না। দ্বিতীয় কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ৬৪ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিককের বরাদ্দ থাকলেও একজন শিক্ষককে প্রায় ২০০ জন ছাত্রকে পড়াতে হচ্ছে। তৃতীয়তঃ স্কুল ভবনে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় অনেক ছাত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। ফলে, পড়া লেখায় স্বাভাবিক অবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সরকার কোন ফলপ্রসু ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ছাত্রদেরকে পাঠ দানের মানসিকতা তারা দিন দিন হারাতে বসেছে।

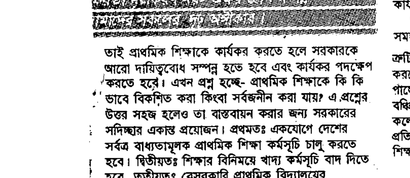

[illegible]

তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে সরকারকে আরো দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হতে হবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- প্রাথমিক শিক্ষাকে কি কি ভাবে বিকশিত করা কিংবা সর্বজনীন করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ হলেও তা বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের সদিচ্ছার একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ একযোগে দেশের সর্বত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাদ দিতে হবে, তৃতীয়তঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রথমে বেসরকারিভাবে বেতন স্কেল ঘোষণা করতে এবং ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারিকরণ করতে হবে। চতুর্থতঃ বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যকলাপের মানন্নোয়ন করতে হবে। এ সকল পন্থা প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ত্বরিত প্রসারিত হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম নয়। সরকারি ঢিলামি গোছের শিক্ষা নীতির ফলে নিম্ন মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার আশানুরূপ বিকাশ হচ্ছে না এবং প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হচ্ছে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। সম্প্রতি সরকার নারী শিক্ষা বিস্তৃতির লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় ছাত্রীদের ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ঘোষণা করেছে এবং উপবৃত্তিও দেওয়ার রীতি চালু করেছে। এ উদ্যোগটিকে স্বাগত জানাচ্ছি। কেননা, নারী শিক্ষা বিকাশ লাভ না করলে সুস্থ জাতি গঠিত হতে পারে না। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির অপব্যাখ্যার ফলে নারীকে কখনো সামাজিক জীবনে প্রগতির সহায়ক শক্তিরূপে দেখা হয় না। অথচ, একজন শিক্ষিত মহিলা একজন যোদ্ধাও বটে। সেও পুরুষের পাশাপাশি সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে শুধু ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হলে নারী শিক্ষা বিস্তৃত করতে হবে। আমাদের দেশের পুরুষ ও নারী শিক্ষার আনুপাতিক হার তুলে ধরছি- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভুক্তিকরণে বালক এবং বালিকার সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য বেশি নয়। ১৯৯০-এর হিসেব মোতাবেক যথাক্রমে ৫৬% ও ৪৪%। এই পার্থক্য উপরের শ্রেণীগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। মাধ্যমিক পর্যায়ে এ হার যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%, উচ্চ মাধ্যমিকে যথাক্রমে- ৭২% ও ২৮%, বিশ্ববিদ্যালয়ে (সাধারণ) এ হার যথাক্রমে ৮০% ও ২০%, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৯৪% ও ৬%, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৩% ও ৭%। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভুক্তিকৃত ছাত্রীদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। এছাড়া গ্রাম ও শহরাভিত্তিক ভুক্তিকরণে নর-নারীর সংখ্যার অসমতা লক্ষ্য করা যায়।

তাই এই অসমতা দূর করার লক্ষ্যে সকল মহলকে নারী শিক্ষা প্রসারিত করার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ভুল। M. C. Q পদ্ধতির শিক্ষাদান ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা গৃহীত হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের জন্য এটি আদৌ কোন নন্দিত পদক্ষেপ নয়। শুধু অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন জাতি হলেও চলবে না, জাতিকে মেধা, প্রজ্ঞায় ও মননশীলতায় স্বয়ংসম্পন্ন হতে হবে। সুস্থ সুশিক্ষিত জনসমাজের কাছ থেকে দেশ ও জাতির অনেক পাবার আছে। কিন্তু বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে M. C. Q পদ্ধতি চালু থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের চেতনার আকাশকে সংকোচিত করে দেওয়া হচ্ছে। তাই এ পদ্ধতির অনতিবিলম্বে বাতিল ঘোষণা কিংবা পদ্ধতিগত পরিবর্তন করে শিক্ষার মানন্নোয়নের জন্য সরকারকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে সমস্যা দেখা দেয় তা পদ্ধতিগত নয়, তবে ব্যবস্থাপনার ক্রটির জন্য যে পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী এস এস সি পাস করছে, তাদের এক দশমাংশ কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে, তারা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকার যদি আন্তরিক হয়ে সকল সরকারি কলেজগুলোতে দু'শিফটে ক্লাশ নেওয়ার ব্যবস্থা করেন তবে প্রতিবছর পাসকৃত এক দশমাংশ ছাত্রদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হতে হবে না।

অতঃপর স্নাতক (পাস ও সম্মান) পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা বেশ হতাশাব্যঞ্জক। কেননা শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের নয়া উদ্যোগকে কি দিয়ে ভর্ৎসনা করব তা খুঁজে পাচ্ছি না। বাংলাদেশে এখনও চরম পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করেনি।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থাৎ এইচ এস সি পাস করার পর অর্ধেকেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় (সাধারণ) মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর কারণ- প্রথমতঃ সীট সংখ্যা সীমিত। দ্বিতীয়ঃ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যে শর্তাবলী আরোপ করে তা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। সরকার আন্তরিক হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে এবং দিবা রাত্রি দু'শিফটে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করে উচ্চ শিক্ষার হাতকে প্রশস্ত করতে পারেন।

সুতরাং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য নয়, শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষা, শুধু কর্মসূচি প্রণয়ন নয়, ত্বরিতগতিতে তার বাস্তবায়ন, শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণ নয়- অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন সুশিক্ষিত জাতি গঠন হোক আমাদের সকলের দৃঢ় অঙ্গীকার।